ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1939-1946
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.418

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ: প্রথাগত রামকথার প্রতিস্পর্ধী আখ্যান

আদিত্য চক্রবর্তী, *গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Chandrabati's Ramayana, composed in medieval Bengal, stands as a distinctive counter-narrative to the canonical Ramkatha tradition. Departing from the Valmikian framework, this text reorients the epic's thematic and emotional centre from Rama to Sita, thereby transforming a predominantly heroic narrative into a deeply gendered and experiential one. Rather than celebrating divine heroism, Chandrabati presents Rama as a flawed human figure, while foregrounding Sita's suffering, resilience, and inner voice.

Drawing upon folk traditions, oral culture, and regional narrative variants, the text resists Brahmanical orthodoxy and challenges the patriarchal structures embedded within traditional retellings of the epic. The selective narration of events, the absence of elaborate war episodes, and the prominence of female experiences collectively contribute to what may be termed a "counter-current" discourse within the Ramayana tradition.

Furthermore, Chandrabati's portrayal of characters such as Mandodari and Kukua deepens the exploration of women's marginalization, emotional trauma, and social vulnerability in a male-dominated world. The narrative not only reflects personal anguish but also articulates a broader collective feminine consciousness.

Thus, Chandrabati's Ramayana emerges as a significant literary intervention that redefines the moral and ideological contours of the epic. It foregrounds silenced voices, subverts established hierarchies, and offers an alternative, humanized vision of the Ramkatha, making it a crucial precursor to modern feminist reinterpretations.

Keywords: Chandrabati Ramayana, Ramkatha, Counter-narrative, Feminine voice, Sitayan, Patriarchy, Folk tradition, Alternative epic tradition

১

রামকথা প্রাচীন ভারতবর্ষের আদি কাব্যকথা। বেদ-উপনিষদের পরে রচিত হলেও এই স্বীকৃতি রামায়ণ অর্জন করেছে কারণ আদিকবি বাল্মীকিই প্রথম নীরস তত্ত্বালোচনার পন্থা পরিহার পূর্বজ নিটোল আখ্যান গ্রন্থনের মধ্য দিয়ে স্পর্শ করেছন প্রবহমান জীবনসত্যকে। তাই যুগ যুগান্তর অতিক্রম করেও বহমান এই রামকথার ঐতিহ্য, লোকায়ত বিশ্বাস আমাদের 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে', কিন্তু চিরপরিচিত পুরাতন হয়েও তাঁর নিত্যনতুন রূপ আমাদের ক্লান্ত করে না। অনেকটা সময় পেরিয়েছে এই কাব্য। শিকারজীবী সভ্যতার অবসানে কীভাবে কৃষিকেন্দ্রিক জীবনচর্চা গড়ে উঠলো অথবা আর্য অনার্যের ক্ষমতাতন্ত্রের দ্বন্দ্বমুখর ইতিহাস বিধৃত এই

আখ্যান রূপান্তরিত হলো কাহিনিমুখ্য ধর্মশাস্ত্রে। বাল্মীকি রচিত 'নরচন্দ্রমা' বিবেচিত হলো পরমারাধ্য পুরাণ পুরুষ বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র রূপে। মধ্যযুগে প্রাদেশিক ভাষায় যখন রামায়ণ অনুবাদের সূচনা হয়, তখন শ্রীরামচন্দ্রের এই দেবমূর্তি আরো খোলতাই হতে থাকে। রাম-মাহাত্ম্য আরো বেশি করে সম্পৃক্ত হতে থাকে ভারতীয় যাপন-বিশ্বাসের সঙ্গে। তার নামকে কেন্দ্র করে আজও চলে ইতিহাসের খনন, রাজনৈতিক সমীকরণের হিসাব নিকেশ। তোলপাড় হয় দেশের বহুত্ববাদী রাজনীতি।

এ কথা অনস্বীকার্য যে হাজার বছর পূর্বের অতীতের মতো আজও রামকথা তাই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু রামচন্দ্রের এতো মাহাত্ম্যকথা প্রচারের পরেও আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁর চরিত্র, কার্যাবলীও প্রশ্নাতীত হয়ে থাকেনি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে শুরু করে মল্লিকা সেনগুপ্তের 'সীতায়ন' উপন্যাস— সাহিত্যে, ভাবনায় বারবার প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়েছে তাঁর ভূমিকা। দেব মাহাত্ম্যের আবরণ উন্মোচিত করে বারংবার তাঁকে এনে ফেলা হয়েছে দোষগুণ সম্পৃক্ত মানুষ হিসাবে। কিন্তু এ তো আধুনিক জীবনবোধ, দর্শনের কথা। কিন্তু যে সময় ছিল দেবমাহাত্ম্য কীর্তনই ছিল কাব্য, দিকে দিকে রামায়ণ এর অনুবাদ তাঁকে ভগবৎ মহিমায় বৃত হয়ে সুউচ্চ বেদীতে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে, চলছে ভাগবত, মহাভারতেরও অনুবাদ, চৈতন্য প্রভাবে যখন বৈষ্ণবধর্মকে অবলম্বন করে রচিত হচ্ছে একের পর এক গীত, মঙ্গলকাব্যের রচয়িতারা মনসার পরে আরো নতুন নতুন দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারে মগ্ন, সেই সময়ে মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের পাতুয়ারি গ্রামের এক শিবমন্দিরে বসে নীরবে এক নারীর হাতে জন্ম নিচ্ছে এক নতুন রামকথা। যে রামকথার উৎস দৈব আজ্ঞায় নয়, জীবনের আদেশে। যার প্রতিটি উচ্চারণে মিশে যায় সুদীর্ঘকালের নারীর অবজ্ঞা, যন্ত্রণার দুঃসহ ইতিহাস। এইভাবেই সেই ভাবাবেগ আপ্লুত সময়েই সৃষ্টি হলো "রামায়ণী কথার প্রতিস্রোতী এক ভিন্ন বয়ান"[১] যা প্রচলিত রাম গুণকীর্তনের ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করে প্রতিষ্ঠা করে রামকথার এক প্রতিস্পর্ধী স্বর। পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের কলমে লেখা পুরুষ পৃথিবীর ন্যারেটিভে চাপা পড়া নারীর বেদনাবিধুর কণ্ঠস্বরকে প্রতিষ্ঠা করবার দায় নিলেন যিনি, তিনি হলেন বঙ্গের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী।

২

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীকে বাঙালি পাঠক সমাজের কাছে প্রথম পরিচয় ঘটান বিখ্যাত গবেষক, সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে। চন্দ্রাবতী সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন–

> "বনে অনেক সময় এমন ফুল ফুটে, রাজোদ্যানেও তাহার তুলনা মিলেনা, সে বনফুলের সৌন্দর্য্য কেহ উপলব্ধি করিতে, কিম্বা সে সৌরভ কেহই ভোগও করিতে পারে না, বনের ফুল বনে ফুটে বনেই শুকায়। চন্দ্রাবতী এইরূপ একটি বনফুল, ময়মনসিংহের নিবিড় অরণ্যে, এক সময় এই সুরভি কুসুম ফুটিয়াছিল।"[২] ('সৌরভ' পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩২০ বঙ্গাব্দ)

চন্দ্রাবতী রাজ অনুগ্রহ পাননি। তাঁর রচিত রামায়ণের কোনো লিখিত পুথি মেলেনি। সেই জন্যই এই লেখিকা পণ্ডিত সমাজের গোচরে এসেছেন অনেক পরে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে এই চন্দ্রাবতীকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জ এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষ জীবিত রেখেছে। "চন্দ্রাবতী সেই প্রান্তিক মানুষগুলোর প্রাণের কবি"[৩]। শুধু রামায়ণ নয়, 'মলুয়া', 'দস্যু কেনারামের পালা', অসংখ্য গান, মেয়েদের ব্রতর ছড়া এই সব কিছুকেই সযত্নে তারা মুখ থেকে মুখে সংরক্ষিত করে রেখেছেন। কবি নয়ানচাঁদ প্রণীত 'চন্দ্রাবতী পালা' নামে তাঁর জীবন আধারিত এক করুণ রসাত্মক গীতিকা চন্দ্রাবতীকে কিংবদন্তী করে তুলেছে। কবি নয়ান চাঁদ রচিত এই পালা পাঠে জানা যায়, চন্দ্রাবতী বাল্যকালে জয়ানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ বালকের সঙ্গে পরিচিত হন; যৌবন সমাগমে সেই পরিচয় প্রেমে পরিণত হয়। উভয় পক্ষের অভিভাবকের সম্মতিক্রমে যেদিন রাত্রে বিবাহের আয়োজন হয়, সেইদিন অপরাহ্নে সংবাদ আসে যে আশমানী নামে একটি কন্যার প্রতি জয়ানন্দ

আসক্ত বলে দেশের কাজী সাহেব উভয়ের সাদী দিয়াছেন, জয়ানন্দ মুসলমান হয়ে 'জয়নাল' নাম গ্রহণ করেছে। এই ঘটনায় চন্দ্রাবতীর মনে যে নিদারুণ আঘাত এসেছিল, তা থেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য পিতা বংশীদাস কন্যাকে শিবপূজা ও রামায়ণ রচনা করিতে উপদেশ দেন— শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে। চন্দ্রাবতী পিতার উপদেশ পালন করেন। এভাবে পিতার আদেশেই হোক বা আপন ভাগ্যের অভিপ্রায়ে, শিবের সাধক চন্দ্রাবতী যেন হৃদয়ের যন্ত্রণাকেই বাণীরূপ দিয়েছেন তাঁর কাব্যে। তাই রাম থেকে তাঁর যন্ত্রণার ভাষা মুখরিত করবার জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন আর এক জনম দুঃখিনী চরিত্র সীতাকে। চন্দ্রাবতীর এই রামায়ণ চন্দ্রকুমার দে যখন আজ থেকে একশো বছর আগে সংগ্রহ করেন, তখনো কবি চন্দ্রাবতীর গান, ছড়া, রামায়ণ শোনা যেত সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। বিবাহ, অন্নপ্রাশন ও ব্রত উপলক্ষ্যে। বিশেষত সূর্যব্রতর দিনে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি মহিলারা চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সুর করে গাইত।

চন্দ্রাবতীর পিতা বংশীদাস ভট্টাচার্য ওরফে দ্বিজ বংশীদাস ছিলেন ষোড়শ শতকের বিখ্যাত কবি এবং মনসামঙ্গলের রচয়িতা। তিনি শুধু পদ্মাপুরাণ-ই রচনা করেননি, সেই সঙ্গে 'রামগীত', 'চণ্ডী', 'কৃষ্ণগুণার্ণভ' গ্রন্থেরও রচয়িতা। চন্দ্রাবতীর মাতার নাম সুলোচনী দেবী। দ্বিজ বংশীদাস এবং সুলোচনী দেবীর তিন সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠা চন্দ্রাবতী। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেওয়া চন্দ্রাবতী পিতার তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করেন। শুধু তাই ই নয়, অত্যন্ত সুন্দরী এই নারী ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। শোনা যায়, চন্দ্রাবতী ছিলেন পিতার সাহিত্যকর্মেরও এক দক্ষ সহকারী। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন দাবি করেছেন দ্বিজ বংশীদাসের মনসাভাসান বা পদ্মাপুরাণ রচনা করবার সময় পিতার কাব্যের বেশ কিছু দোহা, লাচারী চন্দ্রাবতী রচনা করেছেন। বলাবাহুল্য, তৎকালীন সময়ে সমাজে অবহেলায় বেড়ে ওঠা নারীর চেয়ে চন্দ্রাবতী ছিলেন ব্যতিক্রমী। শিক্ষা তাঁকে বিদুষী করে তুলেছে। যে কারণে প্রেমে প্রতারিত নারী চন্দ্রাবতী আগামী জীবনে বেছে নিয়েছেন সম্পূর্ণ তপস্যীর জীবনকে অভ্যস্ত করার মধ্য দিয়ে। শুরু করেন জীবনের এক নতুন অধ্যায়। আপন হৃদয়ের দর্পণে প্রথাগত রামকথাকে তিনি দেন এক নব রূপ, অভিনব পরিচয়। এভাবেই মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে অসংখ্য পুরুষ কবির মাঝখানে এক নক্ষত্র রূপে আবির্ভূতা হন চন্দ্রাবতী। আজ কৃত্তিবাস, শঙ্কর দেব, নিত্যানন্দ আচার্য প্রমুখ রচয়িতার সঙ্গে উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত এই চন্দ্রাবতী রামায়ণ। যদিও এ রামায়ণ আজ বহুল প্রচারিত নয়। চন্দ্রাবতী রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন নবনীতা দেবসেন। আক্ষেপের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন–

> "সুন্দরী মলুয়া ও দস্যু কেনারাম যদিও বা বাংলার ছাত্রছাত্রীরা নাড়েচাড়ে, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ তারা উল্টেও দেখে না, সাহিত্য সমাজ থেকে তাকে দুদ্দূর করে হটিয়েই দেওয়া হয়েছে যে।"[৪]

আসলে চন্দ্রাবতীর রামায়ণকে দীনেশচন্দ্র সেন, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো পণ্ডিতবর্গ গুরুত্ব সহকারে দেখে, তাকে প্রকাশ করে বাঙালি পাঠকের কাছে পরিচয় ঘটনোর উদ্যোগ নিলেও ভাষাতত্ত্বের বিচার করে সুকুমার সেনের মতো অনেক পণ্ডিতই খানিক অবহেলায় দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে নবনীতা দেবসেন বলেন-

> "বছরের পর বছর ধরে আমাদের বাংলা সাহিত্যের হর্তাকর্তা যাঁরা, সেই পণ্ডিত-পুরুষ সুরক্ষীদের দ্বারা একটি দুর্বল মহাকাব্য এবং অসম্পূর্ণ কাজ হিসাবে উপেক্ষিত ও বর্জিত হয়ে এসেছে 'চন্দ্রাবতী রামায়ণ'। একেই আমরা বলছি টেক্সটের কণ্ঠরোধ। রাম-স্তুতি নেই বলে এই রামায়ণকে দীন মনে করা হল। এবং মৌখিক লৌকিক গানের রচনাশৈলীকে ধ্রুপদী কাব্যের রচনাশৈলীর সঙ্গে তুলনা করে একে দুর্বল এবং গুরুত্বহীন সাহিত্যকৃতি বলে খারিজ করে দেওয়া হল।"[৫]

পুরুষ শাসিত এই আধিপত্যকামী সমাজে চন্দ্রাবতী রামায়ণ সবিশেষ পরিচিতি লাভ না করলেও আপন শক্তিতেই তা সম্পূর্ণভাবে তলিয়েও যায়নি। আজ যখন নারীর অর্ধেক আকাশের অধিকার প্রবল স্বরে উচ্চারিত হয়, তখন সেই যুগের দাবিতেই এই চন্দ্রাবতীর লেখা পুনঃসঞ্জীবিত হয়ে ওঠে স্বাভাবিক নিয়মে।

৩

চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণের বিশিষ্টতার অনুসন্ধানে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার আয়তনের স্বল্পতা। আয়তনের বিচারে এই রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। চন্দ্রাবতী রামায়ণে কোনো 'কাণ্ড' বিভাজন নেই। রয়েছে তিনটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে ৮টি, দ্বিতীয় খণ্ডে ২টি এবং তৃতীয় খণ্ডে ৯ টি অধ্যায় রয়েছে। কাহিনি বিন্যাসেও তিনি বাল্মীকি থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন। বরং তার সঙ্গে মালয়, কাশ্মীর, তিব্বত, জাভা দেশে প্রচলিত কাহিনির সাদৃশ্য রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন–

> "মৈমনসিংহের ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব কতকটা আধুনিক। তৎপূর্ব্বে এই দেশে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের নানারূপ কাহিনী ও প্রবাদ দেশময় প্রচলিত ছিল। জনসাধারণ এই সকল উপাখ্যান জানিত এবং চন্দ্রাবতী সংস্কৃত কাব্যের অনুরোধে জনসাধারণকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এই জন্যই তিনি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীগুলির স্থান দিয়াছেন এবং এই জন্যই আর্য্য সমাজের বহির্ভূত প্রদেশসমূহে রামায়ণের যে বিচিত্র উপাখ্যানমালা প্রচলিত ছিল তাহাদের সহিত চন্দ্রাবতীর বিবরণের এইরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য।"[৬]

চন্দ্রাবতী রামায়ণে বাল্মীকি রামায়ণের মতো কাহিনিগত বৈচিত্র্য, জটিলতা, বিস্তৃতি পাওয়া যায় না। এই কাহিনি আসলে সরল, সুন্দর, সুমিষ্ট পালাগান। তার ভাষার বিন্যাসেও তাই নেই মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য। এখানে মুখ্যত রামায়ণের সেই অংশটুকুই আলোকিত হয়েছে যেখানে সীতার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উপস্থিতি রয়েছে। তাঁর রামায়ণে অনায়াসে বাদ গিয়েছে রামের বীরগাথা, যুদ্ধের বর্ণনা, রামের দীক্ষা। নামমাত্র উল্লেখ আছে হরধনুভঙ্গ, অভিষেক, বনবাস, স্বর্ণমৃগ, সেতু নির্মাণ, ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ বধের। রাম নয়, চন্দ্রাবতীর আখ্যানবস্তুর কেন্দ্র যেন এখানে সীতা। নবনীতা দেবসেন তাই এই ভিন্ন ঘরানার রামায়ণকে তাই 'সীতায়ণ' বলে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। তিনটি খণ্ডের প্রথম খণ্ডের নাম 'জন্মলীলা'। বাকি দুই খণ্ডের নামকরণ করা নেই। আবার অধ্যায়গুলির কোনো কোনোটির কাহিনিভিত্তিক নামকরণ হয়েছে, কোনোটির হয়নি। সম্ভবত এই নামকরণ সম্পাদকেরই করা। আমরা এখানে এই তিন খণ্ডের উনিশটি অধ্যায়ের নামকরণ বা মূল বিষয়টুকু একটি সারণীতে উল্লেখ করবো, যার মাধ্যমে এই রামায়ণের কাহিনি বৃত্তটি সহজে বোঝা যাবে।

- প্রথম খণ্ড (জন্মলীলা):
- প্রথম অধ্যায়: লঙ্কার বর্ণনা।
- দ্বিতীয় অধ্যায়: রাবণের স্বর্গজয়।
- তৃতীয় অধ্যায়: রাবণ কর্তৃক মর্ত্য ও পাতাল বিজয়।
- চতুর্থ অধ্যায়: সীতার জন্মের পূর্ব সূচনা এবং মন্দোদরীর গর্ভসঞ্চার ও ডিম্বপ্রসব।
- পঞ্চম অধ্যায়: মাধব জালিয়া ও সতা জাল্যানী। ষষ্ঠ অধ্যায়: ডিম্ব নিয়ে জনক মহিষীর কাছে সতার গমন।
- সপ্তম অধ্যায়: রামের জন্মের পূর্ব সূচনা।
- অষ্টম অধ্যায়: রামের জন্ম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুদ্রের জন্ম এবং কুকুয়ার জন্ম।

চন্দ্রাবতী রামায়ণের দ্বিতীয় খণ্ডের আলাদা কোনো নামকরণ করা হয়নি। এই খণ্ডে সীতার কাহিনী প্রাধান্য লাভ করেছে। এই খণ্ডে কবি জনক দুহিতা সীতার মুখে তাঁর কাহিনী বর্ণনা করিয়েছেন। এই খণ্ড মোট দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত:

প্রথম অধ্যায়: বনবাস পূর্ববর্তী জীবনের কাহিনী।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বনবাসের ঘটনায় পরিপূর্ণ। যাকে নামকরণ করা হয়েছে 'সীতার বারোমাসি'।

এই রামায়ণের তৃতীয় খণ্ডটিও দ্বিতীয় খণ্ডের মতো নামকরণ বিহীন।মোট নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত:

- প্রথম অধ্যায়: সীতার বনবাসের পূর্ব সূচনা।
- দ্বিতীয় অধ্যায়: সীতার বিরুদ্ধে কুকুয়ার চক্রান্ত। তৃতীয় অধ্যায়: রামচন্দ্রের কাছে সীতার বিরুদ্ধে কুকুয়ার মিথ্যা অভিযোগ দায়ের।
- চতুর্থ অধ্যায়: রামচন্দ্রের সীতাকে পুনর্বার বনবাসে পাঠাবার সিদ্ধান্ত।
- পঞ্চম অধ্যায়: সীতার বনবাস।
- ষষ্ঠ অধ্যায়: সীতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রয়দান ও লব-কুশের জন্ম।
- সপ্তম অধ্যায়: সীতার সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ। অষ্টম অধ্যায়: রামচন্দ্রের সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ। নবম অধ্যায়: সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও পাতাল প্রবেশ।

এই কাহিনিবিন্যাস দেখলেই অনুমান করা যায় যে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের চেয়ে কতটা স্বতন্ত্র।

প্রথম খণ্ডের বর্ণনায় যে তিনটি অভিনবত্ব সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিগোচর হয়, তা হলো রামের জন্মবৃত্তান্তের আগে সীতার জন্মবৃত্তান্তের বর্ণনা, দ্বিতীয়ত সীতা মন্দোদরীর শরীরজাত কন্যা, যাকে সে ডিম্বরূপে প্রসব করেছেন কিন্তু তার জন্মের সঙ্গে রাবণের কোনো প্রত্যক্ষত সংযোগ নেই। তৃতীয়ত, বাল্মীকি রামায়ণের শান্তা চরিত্রের পরিবর্তে রামের অনুজা রূপে কুকুয়া চরিত্রের আগমন। এই চরিত্রটিও কাশ্মীরি, জাভা, কম্বোজ, মালয় দেশের রামায়ণের অনুসারী। কুকুয়া এক আত্মকেন্দ্রিক, পরনিন্দা পরচর্চাকারী, কুটিল স্বভাবের নারী। মনে করা হয় চন্দ্রাবতীর প্রেমিক জয়ানন্দ যে মুসলমান নারীর সঙ্গে বিবাহ করেছিল সেই চরিত্রের সঙ্গে এই কুকুয়ার সাদৃশ্য আছে।

চন্দ্রাবতী রামায়ণের দ্বিতীয় খণ্ডটি সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সীতা একমাত্র বক্তা। সীতার বাচনে প্রকাশিত হয়েছে তার শৈশব-কৈশোর-যৌবনের অভিজ্ঞতার ডালি। সীতার ছোটবেলা থেকে বিবাহ, বিবাহোত্তর জীবন সবটাই বর্ণিত হয়েছে এই স্থানে। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে রামায়ণের 'বালকাণ্ড'কে চন্দ্রাবতী জায়গা দিয়েছেন 'জন্মলীলা'য়। অন্যদিকে তৃতীয় খণ্ডে এসেছে রামায়ণের 'উত্তরকাণ্ড'এর ঘটনাসমূহ। তাই এই দ্বিতীয় কাণ্ডে সীতার বয়ানে তিনি অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আসলে বাকি পাঁচটি খণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহকেই মৃদুভাবে স্পর্শ করে গেছেন। সম্পূর্ণ কাহিনিই বিবৃত হয়েছে করুণ রসের মধুর ঝঙ্কারে। এখানে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এর চতুর্থ পর্বে সরমার কাছে সীতা পঞ্চবটী বনের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, সেইরকম বর্ণনাই এখানে পাওয়া যায়। 'সীতার বারোমাসি' অংশে এই সরমা চরিত্রটিকে আমরা পাই। এ থেকে দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করেন যে–

> "আমার বিশ্বাস মাইকেল মৈমনসিংহের কবির রামায়ণটি কোনো স্থানে শুনিয়া মহিলা-কবির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।"[৭]

তৃতীয় খণ্ডের সূচনা হয়েছে এমন এক ঘটনা দিয়ে যা কোনো রামায়ণেই উল্লেখ নেই। তা হলো রাম সীতার পাশাখেলা। এক রোমান্টিক ঘন পরিবেশ তৈরি হয়েছে এখানে। সীতা কর্তৃক রাবণের ছবি অঙ্কন, কুকুয়ার ক্রূরতা, রামের অবিবেচক কাজ এবং সীতার সকরুণ পরিণতির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে এ অংশে।

চন্দ্রাবতী রামায়ণের চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে প্রথমেই যা উল্লেখযোগ্য, তা হলো রামচন্দ্রের যে 'নরচন্দ্রমা', 'পতিতপাবন' অবতার রূপ, চন্দ্রাবতী তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। জন্মলীলায় রামকে 'নারায়ণ' বলে উল্লেখ করলেও রামচন্দ্র সমগ্র আখ্যানে একজন দোষে গুণে পরিপূর্ণ, দেবমহিমাবিহীন, রক্তমাংসে নির্মিত এক অতি সাধারণ মানুষ। এখানে রামের বীরত্ব নেই, সে কোনো কোনো স্থলে ভীরু, অবিবেচক। স্বামী, রাজা, যোদ্ধা কোনো ভূমিকাতেই তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ নন। কুকুয়ার প্ররোচনায় সীতাকে অযোধ্যা থেকে বের করে দিলে সমগ্র রাজ্যটিই লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যায়। আবার এই অবস্থায় অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রয়োজনে সীতাকে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য বন থেকে ফিরিয়ে এনেও নিষ্ঠুর মানুষের মতো দুই সন্তানের সামনে মা কে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেন। তাই রামের মতো স্বামী পেয়ে সীতা আক্ষেপের স্বরে ব্যক্ত করে নিজের যন্ত্রণার কথা–

"জনম দুঃখিনী সীতা গো, দুঃখে কাটে কাল।
রামের মত পতি পাইয়্যা গো, মোর দুঃখের কপাল।।"[৮]

সীতার মতোই আর এক করুণ, দুঃখিনী নারী এখানে মন্দোদরী। তাঁর স্বামী রাবণ এখানে অত্যাচারী, অহংকারী, দুর্বিনীত। ব্রহ্মার বরে প্রাপ্ত অপরিসীম শক্তিকে সে ব্যবহার করে পরপীড়নের কাজে। শক্তির দম্ভে যেমন সে দেবতা, মুনিদের হেনস্তা করেন তেমনই সে পরনারী লোলুপ। দুঃখে কষ্টে নারীত্বের অপমানের যন্ত্রণায় সে বিষ ভেবে পান করলেন রাবণ কর্তৃক আনা মুনিরক্ত 'কালজর'। মৃত্যুর পরিবর্তে রাণী হলেন অন্তঃসত্ত্বা। দশমাস দশ দিন বাদে সে প্রসব করলেন একটি ডিম্ব। জ্যোতিষের গণণায় দেখা গেল—-

"এহি ডিম্বে এক কন্যা গো রাজা আইজ লভিল জনম।
এহি কন্যা হইব গো রাজা স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংসের কারণ।।"[৯]

অতএব, এ ডিম্বকে নষ্ট করাই ছিল একমাত্র বিধেয়। কিন্তু অসহায় মা মন্দোদরীর আর্তি–

"যদি নাই সে রাখো ডিম্ব গো, তবে সাগরে ভাসাও।"[১০]

মূল রামায়ণের বহির্ভূত এই কাহিনি নির্মাণের মধ্য দিয়ে মন্দোদরী চরিত্রের অসহায়ত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থাকে চিহ্নিত করেছেন। আবাল্য প্রেমিক জয়ানন্দের কামুকতা, ব্যভিচারিতা চন্দ্রাবতীকে যেভাবে বেদনার্ত করেছিল, মন্দোদরী চরিত্রের মধ্যে যেন তার প্রভাব বিদ্যমান। বিশ্বাসহীনতাই তো দাম্পত্য সম্পর্কের বিনষ্টির আসল সূতিকাগার, রামের মতো রাবণ চরিত্র-ও তাই সুস্থ দাম্পত্যের সহায়ক হয়নি।

চন্দ্রাবতীর আখ্যানে চরিত্র বিশ্লেষণে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এবং নষ্ট দাম্পত্যের পরিচয় পাই, তা হলো অযোধ্যার রাজকুমারী, কৈকেয়ীর সন্তান কুকুয়া। ভাগ্যদোষে সে কুৎসিত, কুরূপা। স্বভাবে মুখরা। কর্মদোষে তারও সংসার সুখ মেলেনি। সে ঔষধ খাইয়ে স্বামীকে পাগল করেছে। রাম-সীতা সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস স্থাপন, সীতার চরিত্রহননের কু প্রচেষ্টা এসবই সম্পাদিত হয়েছে কুকুয়ার দ্বারা। এই চরিত্র নির্মাণে চন্দ্রাবতীর জয়ানন্দের সঙ্গে বিচ্ছেদের মূলে যে মুসলমান নারীর কথা জনশ্রুতি, তার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কারণ 'চন্দ্রাবতী' পালায় অনুতাপের অনলে দগ্ধ জনায়ন্দ যখন মোহান্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে আসবার আকুতি জানায়, সেখানেও তিনি তার সেই ক্রূর, মুখরা এবং স্বার্থান্বেষী চরিত্রের কথা উল্লেখ করে। সেই নারী অবশ্য সুরূপা হলেও কুকুয়ার কুশ্রী রূপ হয়তো তার স্বভাবকেই চিহ্নিত করে। শুধু তাই-ই নয়, কুৎসিত রূপের কারণে সেই নারীও আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সমাদৃতা হয় না। সেই বঞ্চনাই তার মনকে এমনভাবে বিষিয়ে কুৎসিত করে তুলেছে। যে কারণে যখন সীতার জন্য সাজানো কাঠে আগুন জ্বালাতে গিয়ে কুকুয়ার কেশ পুড়ে যায়, তখন–

"কুকুয়ার কান্দন দেইখ্যা গো সীতা ঠাকুরাণী।

হস্ত বুলাইয়া কুকুয়ার গো শীতল করিল জ্বলুনি।।"[১১]

নারী বলেই হয়তো সীতা কুকুয়াকে, যে কিনা তার জীবন বিপর্যয়ের প্রধান কারণ, তাকেও এইভাবে যাওয়ার আগে শীতল করে দিয়ে যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তার অবস্থানকে অনুভব করেই। আসলে চন্দ্রাবতীর রামায়ণের সবচেয়ে বড় চমৎকারিত্ব এখানেই যে তা ততোটা মূলের অনুসারী নয়, যতোটা না জীবন-সম্ভূত রচনা।

এতগুলি নষ্ট, অসুস্থ সম্পর্কেও মাঝেও চন্দ্রাবতী নির্মাণ করেছেন এক সার্থক দাম্পত্য জীবন চিত্রও। তারা হলো মিথিলার দুই অখ্যাত জেলে-জেলেনী মাধব আর সতা। দারিদ্র্য ক্লিষ্ট জীবনে অর্থাভাব হলেও প্রেম, ভালোবাসা, বিশ্বাস, আন্তরিকতা প্রভৃতি মানবিকগুণের কোনো অভাব তাদের গৃহে ছিল না। চন্দ্রাবতী তার রামায়ণে এই স্বকল্পিত দাম্পত্যের চিত্রণে দেখিয়েছেন বিপুল বিত্তের সমারোহ থেকে দূরেও পারস্পরিক বিশ্বাস, আনুগত্য এবং অকপট ভালোবাসায় জীবনের সার্থকতাকে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই চন্দ্রাবতী রামায়ণে এই সীতা নামকরণও হয়েছে, সতার নাম অনুসারে। মাধব-সতার দাম্পত্যের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে চন্দ্রাবতীর জীবনদর্শন—

"সতী নারীর সাধু পতি গো যদি থাকে ঘরে।
খাওনের পিন্ধনের দুঃখ গো নাই সে অন্তরে।।"[১২]

এইভাবেই এই আখ্যান রাজকীয় আতিশয্যের চেয়ে পল্লীগ্রামস্থ দারিদ্র্য পীড়িত কিন্তু সুখী দাম্পত্যকেই অধিকতর শ্রেয় এবং আদর্শস্থানীয়ভাবে নির্মাণ করে তার রচনার উপভোক্তা অর্থাৎ মৈমনসিংহ জেলার সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা দিয়েছেন।

৪

'চন্দ্রাবতী' রামায়ণকে আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিত করবার দুর্দমনীয় সংগ্রাম করেছিলেন আধুনিক বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন। ভারত এবং ভারতের বাইরে দেশে দেশে সেমিনারে, বক্তৃতায় তিনি চন্দ্রাবতী রামায়ণের সঙ্গে অধিকতর পাঠকের পরিচিতি ঘটানোয় সচেষ্ট থাকেন। ১৯৯১ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তিনি চন্দ্রাবতী রামায়ণ নিয়ে বক্তৃতা দেন। চন্দ্রাবতী রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদও তিনি রচনা করেন যা 'Zubaan' নামে দিল্লির মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়।[১৩] নবনীতা দেবসেন চন্দ্রাবতী রামায়ণকে 'সীতায়ণ' বলে প্রায়ই আখ্যায়িত করতেন। এ অবধি রচনায় যেটুকু পরিচিতি পাঠকবৃন্দ চন্দ্রাবতী রামায়ণ সম্পর্কে পেয়েছেন, তাতে বোধকরি নিঃসংশয়ে এই অভিধাকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু যে সময়ে নারীচেতনাবাদী ভাবনা সূতিকাগারেও প্রবিষ্ট করেনি, যে সমাজব্যবস্থায় তাদের অবস্থান নিতান্তই প্রান্তিক, সেখানে নানাভাবে এই চন্দ্রাবতী রামায়ণ নারীকেন্দ্রিকতায় অভিনবত্ব লাভ করেছে। যেন চন্দ্রাবতী রামায়ণ আধুনিক নারীচেতনাবাদেরই পূর্বপাঠ।

প্রথমত, এ কাব্যের রচয়িতা নারী। বিবাহ, ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠানে এ রচনা গীত হতো। তার গায়কী, শ্রোতাও মুখ্যত নারী। অর্থাৎ স্রষ্টা, উপভোক্তা সবই মহিলা। এবং এভাবেই এক মহিলা দ্বারা সৃষ্টি হওয়া আখ্যান বহু শতাব্দী ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্জীবিত থেকেছে মহিলাদের যত্নশীল চর্চার মধ্যবর্তিতায়।

দ্বিতীয়ত, নামে রামকথা হলেও এই কাব্যে রামের জন্মকথার আগে উপস্থাপিত হয়েছে সীতার জন্মকথাই। শুধু তাই-ই নয়, মূল রামায়ণের সেই সকল প্রসঙ্গই এই ক্ষুদ্রাকৃতির অভিনব রামায়ণে স্থান পেয়েছে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সীতার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

তৃতীয়ত, চন্দ্রাবতী রামায়ণ অনুসারে সীতা মুনিরক্তে বীজীভূত স্ত্রীযোনিজ সন্তান। সীতা কেবল মন্দোদরীর শরীরজাত সন্তান, তার জন্মের ক্ষেত্রে রাবণের সঙ্গে প্রত্যক্ষত কোনো যোগ নেই। আবার মন্দোদরী জন্ম দিলেও ডিম্বরূপী সীতা মাধবপত্নী সতার দ্বারা প্রতিপালিত। আবার এরপরে ঘটনাপরম্পরায় জনকমহিষীর পরিচর্যায় সীতার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। অর্থাৎ সীতার জননী মন্দোদরী, ধাত্রী সতা ও পালয়িত্রী জনকমহিষী। সীতার জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা প্রায় পুরুষ সম্পর্করহিত।

চতুর্থত, চন্দ্রাবতীর রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধ নেই, আর্য অনার্যের দ্বন্দ্বময় ইতিহাস নেই। রাম থেকে যদি চন্দ্রাবতীর আখ্যানের প্রেক্ষণবিন্দু সীতায় প্রতিস্থাপিত হয়, তাহলে রাবণের বদলে এসেছে কুকুয়া। আসলে কুকুয়াকে এখানে দেখানো হয়েছে অশুভ নারীশক্তির প্রতীক হিসাবে। চন্দ্রাবতী এখানে যেন দেখিয়েছেন যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কেবল পুরুষরাই নয়, আত্মকেন্দ্রিক ক্রূর মানসিকতার নারীরাও নারীর জীবনকে বিপর্যস্ত করতে পারে। এখানে কুকুয়া হলো সেই নারী, যা পুরুষতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী।

পঞ্চমত, সীতার জন্ম প্রসঙ্গে রাবণের গণৎকারের গণনা ছিল— "এহি কন্যা হইব গো রাজা স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংসের কারণ।।"[১৪] অর্থাৎ দুর্বিনীত, অহংকারী, নারীলোলুপ রাজার ধ্বংসের মূল কারণ যে সীতা-ই, তা সর্বাগ্রে ঘোষিত।

সর্বোপরি, চন্দ্রাবতী রচিত আখ্যান শুধু মহিলা রচিত নারীকেন্দ্রিক আখ্যানই নয়, তা হয়ে উঠেছে এক স্বাধীনতার আখ্যান, মুক্তির আখ্যান। চন্দ্রাবতীর এই রচনা দেবমাহাত্ম্য কীর্তনের উদ্দেশে তো রচিত হয়নি-ই বরং তা প্রবল পরাক্রমে নস্যাৎ করেছে দেবভক্তিবাদকে। এখানেই চন্দ্রাবতী রামায়ণের প্রধান শক্তি। নবনীতা দেবসেন এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন– চন্দ্রাবতী ব্রাহ্মণদের রামায়ণকে চুপ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর রামায়ণে রামের অবতারত্ব ক্রমশ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে, অনুচ্চারিত থেকেছে তার দেবত্ব, যুদ্ধ দক্ষতা, বীরত্বের প্রসঙ্গ। মধ্যযুগীয় আখ্যানে দৈবমাহাত্ম্যের পথকে পরিহার করে যে জীবন মানবিক আখ্যান চন্দ্রাবতী রচনা করেছেন এখানেই তার অভিনবত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা।

তথ্যসূত্র:

১। নস্কর, সনৎকুমার। 'চন্দ্রাবতী রামায়ণ: 'সীতায়ন'' না 'নারী-মহাকাব্য'? প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য: পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা। দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১১৮।
২। দে, চন্দ্রকুমার। 'মহিলা কবি চন্দ্রাবতী।' চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ। বরকত, হিমেল (সম্পা.), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২ পৃ. ৮২।
৩। ঘোষ, লিপিকা (সম্পা.)। কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ। কেতাব-এ, কলকাতা, ২০২৫, পৃ. ১৫।
৪। দেবসেন, নবনীতা। চন্দ্র-মল্লিকা। দেশ, বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ৬, পৃ. ৯০।
৫। দেবসেন, নবনীতা। তদেব, পৃ. ৯৬।
৬। সেন, দীনেশচন্দ্র। 'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ।' পূর্ববঙ্গ গীতিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২, পৃ. ৫২৪–৫২৫।
৭। তদেব, পৃ. ৫২৬।
৮। ঘোষ, লিপিকা (সম্পা.)। 'কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৪।
৯। তদেব, পৃ. ৫৫।
১০। তদেব, পৃ. ৫৫।
১১। তদেব, পৃ. ১১৯।
১২। তদেব, পৃ. ৫৮।
১৩। তদেব, পৃ. ৩৩।
১৪। তদেব, পৃ. ৫৫।